ISSN:3139-1192(Online)

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

December 2024
Volume- 2

Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya, Ashoknagar,
North 24 Parganas, West Bengal- 743223

Contents lists available at https://scintia.in/

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

ISSN: 3139-1192 (Online)

[Published by Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya]

শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয়

সর্বানন্দ চৌধুরী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী নগর ডে কলেজ, কলকাতা

Correspondent author E-mail address: sarbanandachaudhuri68@gmail.com

কয়েক বছর আগের কথা। বিশ্ববিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীস্বপন চৌধুরী আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসেছেন। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর ফ্ল্যাটের বৈঠকখানায় বসে তবলা শেখাচ্ছেন। ঘরভরতি অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। সেখানে পাখোয়াজবাদক আমার অনুজপ্রতিম শ্রীনিশান্ত্ সিংও উপস্থিত, স্বপনবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। নেপালি ছেলে নিশাহ তখন কালিম্পং থেকে সবে কয়েক মাস কলকাতায় এসেছে। শেখানোর ফাঁকেই স্বপনবাবু নিশান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তো ধ্রুপদ-গায়ক কম, পাখোয়াজ অভ্যাস করো কীভাবে"। নিশান্ত্ বলল, "হ্যাঁ, দু-একজন আছেন, আর আমি আন্দুল কালীকীর্তনের সঙ্গে বাজাই"। যেই-না-বলা, ঘরের ছেলেমেয়েরা হো হো করে হেসে উঠল। নিশান্ত্ হতভম্ব, স্বপনবাবুও একটু অপ্রস্তুত। হাসির কারণটা আমি অনুমান করতে পারলাম। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে বাজায় বললেও হয়তো একরকম ছিল, তা একেবারে কীর্তনের সঙ্গে! যদিও এই কীর্তন, গান হিসেবে খুবই "ক্ল্যাসিকাল" জিনিস। তানসেনের গুরু বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর ধ্রুপদসংগীতের ধারাকে, মধ্যযুগের বাঙালি বঙ্গদেশে প্রবাহিত করেছিল এই

To cite this article: Chaudhuri, S. (2024). শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয়. *Scintia*, 2, 87–95.

কীর্তনের ভেতর দিয়ে। বিশেষ করে গরানহাটি কীর্তন একেবারেই ধ্রুপদ-অঙ্গের এখন সেসব কথা কে কাকে বলবে।

আর এই কালীকীর্তন তো সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আমরা যাকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলি পুরোপুরি সেই জিনিস। আর সেটাই ওদেরকে বলার চেষ্টা করলাম যে, কালীকীর্তন আমাদের একটা ঐতিহ্য। হাওড়ার আন্দুল কালীকীর্তনের দলে, এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধক-কবি মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা প্রেমিক মহারাজের যে গানগুলো দীর্ঘদিন ধরে গাওয়া হয় সেগুলো আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত বা রাগসংগীতের সম্পদ। দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো ভারতবিখ্যাত মৃদঙ্গাচার্য শুধু নন, আরও অনেক গুণী মার্দঙ্গিক এই দলে মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ বাজিয়েছেন। কথাগুলো শুনল বটে। কিন্তু বাংলা গান অথচ শাস্ত্রীয় সংগীত-বিষয়টা ওদের কাছে সোনার পাথর বাটি হল কিনা জানি না। প্রেমিক মহারাজের “ওমা! ভবভয়বারিণি” ধ্রুপদটার ঠিক ঠিক গাওয়া যাঁরা শুনেছেন, বলুন তো, ইমন-কল্যাণের অমন সুন্দর চলনে কথা সুর সব মিলিয়ে ধ্রুপদের অমন চমৎকার একটি রচনা কি চট করে পাওয়া যাবে। অথবা “দেখ না চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে” সেই ধামারটা, সেটাও, কী ভালো। ছোটো বয়স থেকে বাবার কাছে এসব গান শুনেছি। মনে আনন্দ হলে নিজেও মাঝে মাঝে গাই। কিন্তু তা হলেও শাস্ত্রীয় সংগীত বলে আমরা এখন যেটা বুঝি, সেটা আলাদা জিনিস তার পরিধিটা আলাদা।

অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের এখনকার এই ধারণাটা বোধ করি খুব আগের নয়। এখন শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রায় প্রতিশব্দ হিসেবে উত্তরভারতীয় সংগীত, হিন্দুস্থানি সংগীত, রাগসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত, ক্ল্যাসিকাল সংগীত যেসব কথা ব্যবহার করি তাও হয়তো যথেষ্ট অর্বাচীন। এমনকী এই শাস্ত্রীয় সংগীতকে যখন মার্গসংগীত বলছি তখনও প্রাচীন কালে মার্গসংগীত বলতে যা বোঝাত সেটা বোঝাচ্ছে না। তুলনায় হিন্দুসংগীত, ওস্তাদিসংগীত, কালোয়াতিসংগীত শব্দগুলো

হতে পারে খানিকটা পুরোনো। তবু উনিশ শতকে হিন্দুসংগীত বলতে কি আজকের শাস্ত্রীয় সংগীত বোঝাত? শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হিন্দু মিউজিক ওল্টালে কিন্তু ঠিক সেরকম মনে হবে না। এই বইয়ে "হিন্দুস্থানি মিউজিক" কথাটা থাকলেও সেটা আজকের হিন্দুস্থানি সংগীত কতটা? "হিন্দু মিউজিক" বলতে সেখানে হিন্দুস্থানের বা ভারতীয় সংগীতকেই অনেকটা সামগ্রিকভাবে বুঝব। আমাদের সংগীতের রাগ, তাল, স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, অলংকার এই যে মৌলিক বিষয়গুলি আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে বহু দিন ধরে আলোচিত হয়ে এসেছে, সেগুলোই উনিশ শতকে হিন্দুসংগীতের বিষয়। বলা যায় এটা একটা "সিস্টেম" বা পদ্ধতি। আমাদের আজকের শাস্ত্রীয় সংগীত বা উত্তরভারতীয় সংগীত অবশ্যই এই পদ্ধতির অন্তর্গত। কিন্তু আজকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলতে যেভাবে সংগীতের একটা অংশকে, অনেকটাই হয়তো ভাষা বা অঞ্চলের দিক থেকে, আলাদা করে নিয়ে বুঝতে চাইছি সেটা ঠিক হিন্দুসংগীতের ভাবনা ছিল না। হিন্দুসংগীত সাধারণভাবে আমাদের সংগীতের কথা, আমাদের দেশের সংগীত পদ্ধতির কথা। তাই দেশের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ভাষার সংগীতেই এই পদ্ধতির চর্চা স্বাভাবিক।

আর এভাবেই চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলি কীর্তন ও পরবর্তী রচনায় প্রায় হাজার বছরের বাংলা গানে এই পদ্ধতির ব্যবহার চলে আসছে। সেখানেও আমরা অসংখ্য রাগ তাল এসব অনেক কিছুই পাচ্ছি। শুধু বাংলা গান কেন মারাঠি সংগীত, শিখসংগীত নানা ক্ষেত্রেই এমনটা দেখব। মারাঠি নাট্যসংগীত কিংবা শিখদের গুরু-গ্রন্থসাহেবের গানগুলির কথা মনে করতে পারি। আজকের শাস্ত্রীয় সংগীত থেকেও কি এসব গান খুব দূরে। যেমন বাংলা গানের একটা বড়ো অংশও তাই।

হ্যাঁ, এটা ঠিক, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উত্তরভারতের হিন্দি বা হিন্দুস্থানি ভাষার সংগীতের সঙ্গে সরাসরি যোগ আমাদের বেড়েছে। আমরা সেসব সংগীত শিক্ষা ও অভ্যাস

করতে শুরু করেছি। সেখানকার বড়ো বড়ো ওস্তাদ বা পন্ডিতেরা বঙ্গদেশে এসে অবস্থান করেছেন, এখানকার রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। তাঁদের কাছে আমরা ওই দিককার ভাষায় প্রচলিত নানা ধরনের গান-ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুংরি, চতুরং ইত্যাদি এবং নতুন নতুন বহু রাগরাগিণী লাভ করেছি। অনেকে বঙ্গদেশ থেকে ওই অঞ্চলে গিয়েও এইসব সংগীত শিক্ষা করেছেন। আর পরে এই সংগীতের এলাকাই হয়তো রাগসংগীত বা ক্ল্যাসিকাল সংগীত বলে আলাদা করে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু শুরুতে এই ক্ল্যাসিকাল সংগীতের অনুশীলন তো আমরা প্রধানত বাংলা গানের ভেতর দিয়েই করেছি। সে নিধুবাবুর টপখেয়াল বলি বা রঘুনাথ রায়ের চারতুকের খেয়াল। এমনকী রামপ্রসাদের গানেও কবে থেকে জানি না, বহু রাগরাগিণীর ব্যবহার হয়ে আসছে। যার মধ্যে বেশ কিছু ওই সময়ে ওই অঞ্চল থেকে আসা অনুমান করতে পারি। রামপ্রসাদের অনেক গান একেবারে ক্ল্যাসিকাল ঢঙেও গাওয়া হয়। পরে অবশ্য, উত্তরভারতীয় কলাবৎদের কাছে শেখা গান আলাদাভাবে তাঁদের ভাষাতে তাঁদের মতো করে খুবই চর্চা করেছি, গেয়েছি, শিখিয়েছি। আমাদের অনেকে ওই ভাষাতেই অনুরূপ অনেক গান বা বন্দিশও রচনা করেছেন। সেইসঙ্গে যতদূর পেরেছি, বাংলা গানেও এই সংগীতের ধারা বিস্তৃত করে দিয়েছি।

বঙ্গদেশে ক্ল্যাসিকাল সংগীতের যে বিষ্ণুপুর ঘরানা, হিসেবমতো একমাত্র ঘরানা, তার প্রবর্তক রামশঙ্কর ভট্টাচার্য নিজে বাংলা গান লিখেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার আরও যাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয় তারাও অনেকে লিখেছেন। ক্ল্যাসিকাল সংগীতের এই ঘরানার একটা বৈশিষ্ট্যই হয়তো বলা যায় বাংলা গানের চর্চা।

এই ঘরের প্রবাদপ্রতিম গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া যে গানগুলো এখনো রেকর্ডে শুনতে পাই, ভাষা বাদ দিলে, আমরা যাকে ক্ল্যাসিকাল গান বলছি তার থেকে আলাদা করা মুশকিল। এই ধরনের আরও অজস্র বাংলা গানে আমরা ক্ল্যাসিকাল গানের “ফর্ম” বা

রূপগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছি। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ যখন লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় চলে এলেন, তাঁর "যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী" এই "লক্ষ্ণৌ-ঠুংরি" এখানে খুবই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সেটা যতটা না সরাসরি, তার থেকে অনেক বেশি হয়েছিল বাংলা গানের মধ্য দিয়ে।

বাংলা গানের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ বাঙালির গান বইয়ে এই গানটিও রয়েছে। বাংলা গানের পুরোনো বইগুলোতে বাংলা গানের পাশে এই ধরনের "হিন্দি ওস্তাদি গান" অনেক পাওয়া যাবে। কোনো কোনো বইয়ের গোড়ায় প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রে আলোচিত সংগীতের মূল সূত্রগুলির কথা, ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা এরকম বিভিন্ন সাংগীতিক রূপের কথা গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। যে বিষয়গুলি আমাদের ক্ল্যাসিকাল সংগীতের মূল ভিত্তি। বাঙালির গান গ্রন্থের শুরুতে বাংলা গানের একটা যুগই "টপ্পা" নামে অভিহিত। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বাংলার বাইরে থেকে, এই টপ্পা নিয়ে এসে এখানে বাংলা গানে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন নিধুবাবু, কালী মির্জা এঁরা। আর এই বাংলা টপ্পা তো বটেই আখড়াই বা আরও যে সব বাংলা গানের মধ্য দিয়ে উত্তরভারতের বিভিন্ন সংগীতের বিকাশ হয়েছিল তার অনেকটা, ধনীগৃহে বৈঠকী সংগীতের মর্যাদাও পেয়েছিল। যেমন বৈঠকী সংগীত হিসেবে ওইসব গৃহে হিন্দি ওস্তাদি গানের মর্যাদা ছিল। রাজা, জমিদারদের অনেকেই ওস্তাদি গানের পাশে বাংলা গানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। নিজেরাও অনেকে বাংলা গান রচনা করেছিলেন। তাই বাঙালির গান গ্রন্থে "রাজা মহারাজের গান" নামেও একটি অধ্যায় করা হয়েছে। এমনকী যখন আরও আধুনিক কালে সংগীত সম্মেলন শুরু হল, সেখানেও ক্ল্যাসিকাল গানবাজনার সঙ্গে বাংলা গান ছিল। বলা হয় এই সংগীত সম্মেলন ব্যাপারটা শৌরীন্দ্রমোহন প্রথম শুরু করেছিলেন। পরে যখন সাধারণ মানুষের জন্য এখানে সংগীত সম্মেলন শুরু হল, সেই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের উদ্বোধন করেছিলেন কিন্তু বাংলা

গানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরও পরে অল ইন্ডিয়া তানসেন সংগীত সম্মেলনে দবীর খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, রবিশঙ্কর, আমীর খাঁ এঁদের মতো শাস্ত্রীয় সংগীতের বড়ো বড়ো কলাকারের গাজবাজনার পাশেই একটা বিশেষ অধিবেশন করা হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতের জন্য। আর বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর মতো সেকালে শাস্ত্রীয় সংগীতের আরও অনেকেও যে, রবীন্দ্রনাথের গানে ক্ল্যাসিকাল গানের রস পেতেন কিংবা কিছু কাল আগেও যে, রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা ধ্রুপদ বলে সহজেই উল্লেখ করা যেত সেকথাও বোধ হয় মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। বাংলা ধ্রুপদের কথায় অবশ্যই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বাঙ্গালা ধ্রুপদ-মালা বইটির কথাও বলা উচিত।

বাংলা গানের এই বইগুলোতে গানের শীর্ষে যে অসংখ্য রাগরাগিণীর উল্লেখ রয়েছে তা লক্ষ করলে শুধু বাংলা গানে নয়, একটা দীর্ঘ সময় বঙ্গদেশে কী ধরনের রাগ কতটা প্রচলিত ছিল তারও একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। তবে অনেককে বলতে শুনেছি হিন্দি ওস্তাদি গানে যেমন রাগরাগিণীর শুদ্ধতা রক্ষা পেয়েছে, বাংলা গানে সেটা হয়নি। কিন্তু কথাটা ঠিক না। হতে পারে শাস্ত্রীয় সংগীতের থেকে বাংলা গানের দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে, বাংলা গানে শাস্ত্রীয় শুদ্ধতা রক্ষার দায় অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল হয়েছে। কিন্তু বাংলা গানে রাগের শুদ্ধতার কথা ভাবা হয়নি সেটা একেবারেই ঠিক না। পরম্পরা-বাহিত প্রাচীন বাংলা গানগুলো বা বাংলা গানের প্রাচীন স্বরলিপিগুলো মনোযোগ দিয়ে বিচার করলে সেটা বোঝা যায়। বরং বাংলা গানে অনেক রাগরাগিণীর প্রাচীন রূপ যেমন ধরা আছে তেমনি এখনকার অনেক অপ্রচলিত রাগও সংরক্ষিত রয়েছে। দক্ষিণাচরণ সেনের রাগের গঠন শিক্ষা বইতে রাগের গঠন কিন্তু বাংলা গান সামনে রেখেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেকালের বাঙালিরা অনেকেই সংগীতের শাস্ত্রীয় বিষয়গুলি তাঁদের লেখাপত্রে বাংলা গান দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং বাংলা গানে শাস্ত্রীয় শুদ্ধতা না মানার কোনো কারণ দেখি না। আর বাংলা গানে যেখানে আমরা রাগরাগিণী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি

বা তার ভেতর দিয়ে কখনো শুদ্ধতার একটা অন্য স্তরে পৌঁছোতে চেয়েছি, সেখানেও শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীন হয়ে করেছি তাও হয়তো নয়।

আসলে বাংলা গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীত বা ক্ল্যাসিকাল সংগীতের যে একটা আড়াআড়ি বিভাজন সেটা অনেককাল স্পষ্ট হয়নি। তার কারণও হয়তো, বাংলা গানকে বাইরে রেখে "শাস্ত্রীয় সংগীত" বলে সংগীতের একটা আলাদা ক্ষেত্রও অনেকদিন স্পষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি। আমাদের সংগীতশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি ধরেই আমরা বাংলা, হিন্দি নানা ধরনের গানে একসঙ্গে এগোতে চেয়েছি। কিন্তু তখনও বাংলা গান আর হিন্দি ওস্তাদি গানের সম্পর্কের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা বা "টেনশন" বোধহয় ছিল। অবশ্য সেটা হিন্দি গানের ওস্তাদি বা কালোয়াতির দিক থেকে কতটা আর ভাষার দিক থেকে কতটা সেটা একটা বিষয়। ওস্তাদি কথাটা কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে জানি না, তবে বাংলা গানের একটা প্রাচীন বইয়ের নাম কিন্তু ওস্তাদি কবির গান। যদিও বাংলা গানে হিন্দি গানের ওস্তাদি বা কালোয়াতি জিনিসটা সবাই অতটা যে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়ের সংগীত বিতর্কগুলির মধ্যে প্রবেশ করলে সেটা পরিস্কারভাবেই বোঝা যায়। আমাদের এদিকে উত্তরভারতের কলাবৎদের ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার, শাস্ত্রের দিক থেকে অধিকতর মান্যতার দাবি, ঘরানাদারির চাপ এই সবকিছুই হয়তো সেই উত্তেজনার মধ্যে মিশে ছিল। সেইসঙ্গে ভাষা ও ক্ষমতার গল্পটাও। আর সেখান থেকেই কি কোথাও হিন্দি গানের একটা প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্ব কাজ করেছিল? বাংলা ও হিন্দি গানের সম্পর্কের মধ্যে উঁচু নীচু থাকের বিষয়টা এসে পড়ছিল? না হলে, "হিন্দি ও বাঙ্গালা গান" নিয়ে বলতে গিয়ে "উচ্চ সঙ্গীত বলিতে হিন্দী সঙ্গীতই বোঝায়"- এমন কথা আসবে কেন। যেখান থেকে হয়তো শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতিশব্দ হিসেবে উচ্চাঙ্গসংগীত কথাটাও আসছে। এবং এই বিভাজনের মধ্যে ভাষাটা একটা প্রধান বিষয়।

নিধুবাবু যে “যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্বক রাগ রাগিনীগুণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব” সংকল্প করলেন, এর পেছনে তাঁর শিক্ষকের শিক্ষাদানের কার্পণ্যের বিষয়টা যেমন ছিল তেমনি অন্য ভাষার গানকে নিজের মাতৃভাষায় নিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছাও কম কাজ করেনি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পূর্বাশ্রমে যখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্গীতকল্পতরু বইয়ের গোড়ায় হিন্দি ও বাংলা গানের মধ্যে কেবল ভাষার দিক থেকে পার্থক্য তৈরির বিষয়ে খুব সরাসরি প্রশ্ন তোলেন:

> গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দি ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক সেই রাগ সেই তাল, কেবল ভাষা বাঙ্গলা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইঁহারা সঙ্গীতের মূল সূত্র সকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মুর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী; বাঙ্গালা গাহিলে লোকে আদর করিবে না, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এই কুসংস্কারের কুঞ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাঙ্গালা খেয়াল হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ?

আর এই প্রশ্ন, পরে যে বাংলা গান আর ক্ল্যাসিকাল গানের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজন তার সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে। তাই বঙ্গদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত-চর্চার ইতিহাসে প্রবেশ করতে হলে এই প্রশ্ন এড়িয়ে আমরা করতে পারব না। আজ আমরা শাস্ত্রীয় সংগীত বা ক্ল্যাসিকাল সংগীত বলে যা

বুঝি, সেখান থেকে এই ইতিহাস বোঝা যাবে না। শাস্ত্রীয় সংগীত বা রাগ সংগীতের ঘের আরও বড়ো করে না নিলে এই ইতিহাস, ইতিহাসের জটিলতা আমরা অনুধাবন করতে পারব না। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় যখন বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা লিখেছিলেন তাঁকেও কিন্তু নিধুবাবুর কথা দিয়েই সেই ইতিহাসে প্রবেশ করতে হয়েছিল। এখন আর কেউ সেই গভীর গবেষণাটি হয়তো খেয়াল করেন না। সেই ইতিহাসের কথাও হয়তো বিশেষ কেউ তোলেন না।

তবু আমি গ্রন্থটি প্রায় তিরিশ বছর ধরে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে চলেছি। এবং এই বই যাঁরা পড়বেন, “শাস্ত্রীয় সংগীত” কথাটির সীমাবদ্ধতা থেকে কিছুটা হলেও বেরিয়ে আসতে পারবেন কালীকীর্তনের সঙ্গেও যে পাখোয়াজ বাজতে পারে। হয়তো সেটাও একভাবে মানবেন।